দিনাজপুরের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন*
মোঃ রবিউল হক**

সারাংশ ঃ

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য দিনাজপুরের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রথাগত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রভাব, নগরায়ন, আধুনিকায়ন, খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রভাব সহ যে সব নিয়ামকগুলো কাজ করছে তা সমাজতাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা।

বাংলাদেশ একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ। এদেশে প্রায় ৩১ টি নৃ-গোষ্ঠীর (এথনিক গ্রুপ) বসবাস। এ নৃ-গোষ্ঠীরা তাদের স্বতন্ত্র এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক জীবনের ধারক। বাংলাদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমাদের পরেই সাঁওতালদের অবস্থান। উত্তরবঙ্গে অবস্থানরত নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সাঁওতালরা সংখ্যাগরিষ্ট। উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ঠাকুরগাঁও ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাঁওতালদের দেখা যায়। তবে তারা মূলত রাজশাহী এবং দিনাজপুরেই কেন্দ্রীভূত। বিগত কয়েক দশকে খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের প্রভাব নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাব এবং বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে তাদের প্রথাগত জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ পরিবর্তন তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

দিনাজপুর জেলায় বসবাসরত সাঁওতালরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত নয়। হিন্দু-ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্ম, নগরায়ন এবং শিল্পায়ন তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য দিনাজপুরের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকে সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা। বিশেষ করে পরিবর্তনের নিয়ামকগুলো তুলে ধরা। পাশাপাশি পরিবর্তনের ফলে তাদের যে বর্তমান অবস্থা তা তুলে ধরা। এ পর্যায়ে মাঠ কর্মের ক্ষেত্র হিসাবে দিনাজপুর জেলার তিনটি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পার্বতীপুর থানার চন্দ্রপুর ও উভয় বাসুদেবপুর এবং চিরিবন্দর থানার রাজাপুর যেখানে মাঠ পর্যায়ে এ সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

তবে, কবে, কখন প্রথম সাঁওতালরা এই উপমহাদেশে এসেছিল সে বিষয়ে নৃ-বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও সকলেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, সুদূর অতীতে সাঁওতালরা বাইরের থেকে এসে ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করে।[১] দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাঁওতালরা আদি অস্ট্রোলয়েড (Proto-Australoid) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডেল্টন বলেন, "Their faces are almost round, checkbones moderately prominent, eyes full and straight, nose generally broad and depressed, mouth large and lip very full and projecting, hair straight and black".[২]

Abstract

The main objective of this article is to depict the changing socio-economic condition of *Santal* community of Dinajpur district. It is revealed from the sociological research that some of the major causes of such change include the influence of major ethnic community, the process and effects of urbanization and modernization, the influences of Christian Missionaries and related catalyst agents.

---

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** প্রভাষক, হাকিমপুর ডিগ্রি কলেজ, দিনাজপুর

Bangladesh is a country of cultural diversity. More than 31 ethnic groups live here. These ethnic groups have their distinct and traditional culture and heritage. Among the ethnic groups of Bangladesh the *Santal* is the second largest ethnic community and is followed by *Chakma*. But within North Bengal, the *Santal* community is the largest ethnic group who normally live in the districts of Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Pabna, Bogra and Thakurgaon. But this minority community has been concentrated mostly in the districts of Rjshahi and Dinajpur, For the last several decades there is a significant change that happened in the traditional lives of this community and the reasons include the impacts of religious ethos of Christinity, Hinduism and Islamism; urbanization, industrialization and socio-economic and political factors .These kinds of changes have influenced their socio-economic lives to a greater extent.

As the *Santal* community of Dinajpur district are subject to the influence of Hindu, Muslim and Christian religion and also influenced by modern urbanization and industrialization process, one of the main objectives of this article is to portrait the nature of socio-economic changes of *Santal* community from the perspective of sociological observation.

Though there is not a clear understanding regarding the exact arrival time of *Santal* community in Bangladesh, it is agreed by all anthropologists and sociologists that they settled in at the earliest convenient time. From the evidence of physical traits, the *Santal* people belong to Proto-Australoid Race. According to Delton, the physical traits of *Santal* people include : 'their faces are almost round, cheekbones are moderately prominent, eyes are full and straight, nose are generally broad and depressed, mouth are large and lip are very full and projecting, and hair are straight and black'.

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

দিনাজপুরের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সাঁওতালরা যথেষ্ট অতিথি পরায়ন। তাই তাদের কাছ থেকে তথ্য পেতে আমাদের খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

গবেষণাধীন গ্রামগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

এ তিনটি গ্রামে বসবাসরত সাঁওতালদের সংখ্যা প্রায় ৪৫০ জন। দিনাজপুর শহর থেকে চিরির বন্দরের দূরত্ব ২২ কি.মি.। চিরিরবন্দর থেকে ৫ কিঃ মিঃ উত্তরে রাজাপুর গ্রাম অবস্থিত। এ গ্রামের পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৫টি। এ গ্রামের ১০০% লোকই সাঁওতাল খ্রিস্টান। এদের মূল পেশা কৃষিকাজ। বর্গাচাষের পাশাপাশি এরা কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবেও কাজ করে। এ গ্রামে একটি প্রাথমিক এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫২ জন এবং মেয়েদের সংখ্যা ৪৮ জন। রাজাপুর থেকে ২ কি. মি. পূর্বে পার্বতীপুর থানায় উত্তর বাসুদেবপুর গ্রাম অবস্থিত। এ গ্রামে প্রায় ৩৫টি পরিবারের বাস। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। এদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৭ জন ও ৯৩ জন। এ গ্রামের ৬টি পরিবারের সদস্যরা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এ গ্রামে বর্তমানে একটি গীর্জা নির্মানাধীন রয়েছে। 'গ্রাম বিকাশ' নামক 'এনজিও' র সহায়তায় এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের প্রায় সকল শিশুই এ বিদ্যালয় হতে পাঠ গ্রহণ করছে। গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতালই দিনমজুর। উত্তর বাসুদেবপুর গ্রাম থেকে ২ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে চন্দ্রপুর গ্রাম অবস্থিত। এ গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭৮ জন ও মহিলার সংখ্যা ৭২ জন। পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩০টি। এদের মধ্যে ৪টি পরিবারের সদস্যরা সাঁওতাল খ্রিস্টান। এ গ্রামে ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং

একটি স্যাটেলাইট (সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত) বিদ্যালয় রয়েছে। এ গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতালই দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। ৩টি গ্রামের অধিকাংশ বাড়ী মাটি ও চালার তৈরী। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে এদের বাড়ীগুলোর রয়েছে বিশেষ পার্থক্য। কেননা এরা নিজস্ব পদ্ধতিতে দৃষ্টি নন্দন ভাবে ঘরগুলো তৈরী করে। ৩টি গ্রামেই সাঁওতালদের নিজস্ব জমির পরিমান অতি সামান্য। অধিকাংশ বর্গাচাষী হিসেবে চাষাবাদ করে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, সাঁওতালরা দিনাজপুর অভিবাসন করে ব্রিটিশ আমলে। পূর্বে শিকারী থাকলেও পরবর্তীতে এখানে আসার পর তারা কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এরা সাঁওতাল পরগনা হতে দলে দলে এসে দিনাজপুর জেলার বিস্তৃত পতিত জমি চাষাবাদ শুরু করে।[৩] চাষাবাদ পুনর্গঠিনের জন্য দিনাজপুর জেলার জমিদার দেওয়ান জানকিরাম এ অঞ্চলে সাঁওতাল শ্রমিক আমদানী (১৭৮৩) করেন বলে জানা যায়।[৪] বাংলাদেশে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের সময়কাল নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা যায়, ১৮৯১ সাল থেকে বা তারও পূর্ব থেকে পরিত্যক্ত এলাকা আবাদের জন্য ছোট নাগপুরের সাঁওতালদের এখানে আনয়ন করা হয় এবং সেই সময় থেকে সাঁওতালদের এই এলাকায় আগমন চলতে থাকে।[৫] মূলত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দিনাজপুরে সাঁওতালরা কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এক স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে।

সামাজিক পরিবর্তন ঃ

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, পোষাক-পরিচ্ছেদ খাদ্যাভাস। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক কারণে তাদের প্রথাগত সনাতন ব্যবস্থায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সাঁওতাল ধর্ম বিশ্বাসে রয়েছে অসংখ্য দেবতা, দৈবশক্তি এবং আত্মার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত পুজা, আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসব পালন। সাঁওতাল ধর্ম অসংখ্য বোঙ্গা ও দুষ্ট আত্মাকে ঘিরে আবর্তিত।[৬] সাঁওতালদের প্রধান দেবতা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য পাওয়া যায়। ডেল্টনের ভাষ্য অনুসারে,[৭] সিং বোঙ্গা (সূর্য দেবতা) হলেন সাঁওতালদের সকল দেবতার প্রধান। আলী বলেন,[৮] " The cheif of the supernatural being is Known as Maran Buru (god residing on the hill) । বিজলী[৯] সাঁওতালদের বিভিন্ন জনপ্রিয় দেবদেবী সম্পর্কে তার ভাষ্য ব্যক্ত করেছেন। তার মতানুযায়ী, সাঁওতালদের জনপ্রিয় দেব দেবীর মধ্যে প্রধান হলেন মারাং বুরু। মোরেকো আগুনের দেবতা। মোরেকোর বোন জারের। এরা পবিত্র বনভুমির দেবী। পরগনা হলো সব বোঙ্গামের প্রধান এবং ডাইনিদের প্রভু। দেবতার ধারণায় সাঁওতালরা প্রায় হিন্দুদের মত বহুশ্বরবাদী, তাদের অসংখ্য দেবতাবাদী বিশ্বাস প্রবরণতার সঙ্গে গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য দেবতাবাদীতার তুলনা করা চলে। এদের মধ্যে কেউ ইষ্ট ও কেউ দুষ্ট দেবতা বলে পরিচিত, উভয়েই সমান পূজা অর্চনা লাভ করে, যাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে বেজার না হয়।

বর্তমানে দিনাজপুরের সাঁওতালরা খ্রিস্টান দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে চিরিরবন্দর থানার রাজাপুর গ্রামে সাঁওতালদের প্রথাগত ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে বহুলাংশে প্রবর্তিত হচ্ছে। সেখানে গড়ে উঠেছে একটি আধুনিক গীর্জা। খ্রিস্টান ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সেখানে প্রতিনিয়ত পালিত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা তাদের প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান সাঁওতাল হিসেবে চিহ্নিত করছে। উঃ বাসুদেবপুর গ্রামের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরাও নিজেদের খ্রিস্টান সাঁওতাল হিসেবে বৃহত্তর সমাজে তাদের পরিচয় তুলে ধরছে।

সাঁওতালদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পেছনে কারণ হিসেবে মূলত কাজ করছে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি। অধিকাংশ সাঁওতালরাই দিনমজুর হিসেবে জীবন যাপন করে। তাদের সামাজিক অবস্থান বৃহত্তর মুসলিম সমাজের কাছে অত্যন্ত দূর্বল। কিন্তু একজন খ্রিস্টানদের সামাজিক মর্যাদা বৃহত্তর সমাজের কাছে সাঁওতালদের তুলনায় অনেক বেশি। বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারীগুলো অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে দিচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং বিশেষ নিরাপত্তা। এখানে উল্লেখ্য, ১৮৬০ সালে খ্রিস্টান মিশনারীগুলো সাঁওতালদের মাঝে

তাদের প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রসঙ্গে আলী বলেন,[১০] " The impact of organized Chirstian missionary activity on the santals of santal pargonas may be dated from 1860 when the church missionary society of England began to work among the santals of Damin-i-hoh. Other missions soon followed. খ্রিস্টান মিশনারীগুলো পরবর্তীতে ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদেরকে প্রভাবিত করে। সম্প্রতি দেখা গেছে, উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলে খ্রিস্টান মিশনানারীগুলো তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ৬টি পরিবার ইতিমধ্যে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারীগুলো বিভিন্নভাবে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামে শিশু শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে সাঁওতালদের মাঝে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণাধীন ৩টি গ্রামেই দেখা যায়, প্রায় ১০০% শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ গ্রহণ করছে। দেখা গেছে, উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামে খ্রিস্টান মিশনারী সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০ জন ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করছে। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন খ্রিস্টান সাঁওতালরা। পক্ষান্তরে, বৃহত্তর মুসলিম সমাজ তাদের এসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কেননা দীর্ঘ দিন থেকে তাদের বিবেচনা করা হয় অবজ্ঞা ও অবহেলার দৃষ্টিতে। সাঁওতালদের জীবন প্রণালীর সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তেমনভাবে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এগিয়ে আসেনি।

আধুনিকতার ছোঁয়া, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও নগরায়নের ফলে পোষাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও দিনাজপুরের সাঁওতালদের মধ্যে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রথাগত ভাবে দীর্ঘ দিন থেকে সাঁওতাল পুরুষেরার "নেংটি' এবং মহিলারা 'কাপা' নামক ঐতিহ্যবাহী দুই টুকরা কাপড় পরতো। কিন্তু গত শতাব্দির সত্তর এর দশক থেকে সাঁওতাল পুরুষরা লুঙ্গি এবং মহিলারা শাড়ি পরিধান করে। পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখলে বৃহত্তর সমাজের সাথে তাদেরকে পৃথক করার কোন অবকাশ নেই। পূর্বে সাঁওতাল মেয়েরা অলংকার পরতে পছন্দ করলেও ঐতিহ্যবাহী রূপার অলংকারাদি অর্থাৎ 'মান্দালী', কানে 'দুল', সিঁথিতে 'সিথির পাটি', হাতে 'বালা' ও 'চুড়ি', বাহুতে 'বাজু', কোমরে 'বিছা', পায়ে 'বঙ্কি', হস্ত আঙ্গুলে 'অঙ্গুরী' এবং পদাঙ্গুলে 'বটরি' ইত্যাদির পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত ইমিটেশনের নানা সস্তা গয়না ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।[১১] এছাড়া তাদের ঐতিহ্যবাহী অলংকারাদি সহজেই পাওয়া বা তৈরী করা যায়না। পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এবং বাঙ্গালি কৃষকদের চাষাবাদ ও অকৃষি কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার ফলে বৃহত্তর জনগোষ্টির পোষাক গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছে।

বর্তমানে সাঁওতালদের খাদ্যাভাসেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। এক সময় এরা ইঁদুর, বেজি, খরগোশ, বনবিড়াল এবং বিভিন্ন পাখি শিকার করে তাদের মাংস খেত। এছাড়াও তারা নদী থেকে শামুক এবং মাছ ও বর্ষাকালে পুকুর এবং ধানক্ষেত থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করে খায়। এর পাশাপাশি শুকরের মাংস এদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল। বিশেষ অনুষ্ঠানে সাঁওতালেরা হাড়িয়া (হান্ডি) নামক পানীয় প্রস্তুত করে। হাড়িয়া মূলত গদ (সাঁওতালী ভাষা, এক ধরনের গাছের শিকড়) শতমূল, চালের আটা এবং ভারত থেকে আমাদানিকৃত বড়ির (ভেষজ দ্রব্য দিয়ে তৈরী) বিভিন্ন ফলমূল এবং শাং আলু (সাঁওতালী ভাষা) তারা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে খায়। তবে, বর্তমানে তারা পূর্বের ন্যায় শিকার করার জন্য পর্যাপ্ত বন্য প্রাণী এবং ফলমূল খুঁজে পায়না। কেননা বর্তমানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বন-জঙ্গল পরিস্কার করে তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন বন্য পশু পাখিও হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এদের মানসিকতারও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রচুর সময় ব্যয় করেও শিকার না পাওয়ায় হাঁট বাজার থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায় খাদ্য কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তাছাড়া শিকারের জন্য সময় অপচয়ের চেয়ে সেই সময়ে কোন কাজ করে অর্থ উপার্জনকেই অধিক গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে তারা প্রথাগত রীতি নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তারা পুরোপুরিভাবে বৃহত্তর বাঙ্গালীদের খাদ্যাভাসের সাথে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে দিনাজপুরের সাঁওতালদের মধ্যে আধুনিকতার একটু ছোঁয়া লেগেছে। পূর্বে তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ভেষজ উদ্ভিদ এবং ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করতো। তাদের মাঝে ছিল পেশাদার ওঝা ও

কবিরাজ। সর্দি-কাশি জ্বর আমাশায় সহ প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে তারা ভেষজ উদ্ভিদের পাশাপাশি ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করতো। কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে বর্তমানে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। মিশনারী ও এনজিওগুলো নিরাপদ মাতৃত্ব, সেনিটেশন ব্যবস্থা, নিরাপদ পানি, শিশুদের টিকা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাচ্ছে। তাছাড়া তারা অনেক ক্ষেত্রে এখন সহজেই ভেষজ উদ্ভিদগুলো খুঁজে পায়না। কালের বির্বতনে সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পেশাদার কোন কবিরাজও এখন তাদের মধ্যে দেখা যায় না। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্ম শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ায় আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে অধিক আগ্রহী। তবে ডাক্তারের সেবা পেলেও ঔষধের মূল্য অধিক হওয়ায় অনেকেই আধুনিক ঔষধ ও অন্যান্য সেবাদি গ্রহণ করতে পারছে না। ১৯৮৩ সালে পার্বতীপুর থানার রাজাবাসর এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মিত হয়। ল্যাম্প হসপিটাল নামক এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বধানে রয়েছে খ্রিস্টান মিশনারীগুলো। এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বসবাসরত ধর্মান্তরিত অনেক খ্রিস্টান সাঁওতাল এখানে চাকুরি গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সাধারণ সাঁওতালদের চিকিৎসাক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ অগ্রাধিকার এবং সুযোগ সুবিধা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে মোট ব্যয় দশ হাজার টাকা হলে তাদেরকে দিতে হয় চার হাজার টাকা। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে নাম মাত্র মূল্যেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সাঁওতালদের খ্রিস্টান ধর্ম এবং রীতিনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পূর্ববর্তী সময়ে সাঁওতালদের মধ্যে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরিবারের সকল সদস্য একসাথে বসবাস করতো। একই চুলায় খানা গ্রহণ করতো। সবার মধ্যে ছিল একতা। ফলে আর্থিকভাবেও তারা ছিল কিছুটা স্বচ্ছল। কিন্তু বিংশ শতাব্দির আশির দশক থেকে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, বৃহত্তর বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রভাব এবং নগরায়নের প্রভাবে তাদের যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছে। গ্রামাঞ্চলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যৌথ পরিবারের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যার প্রভাব সাঁওতালদের মধ্যেও বর্তিয়েছে। যৌথ পরিবারের সবার আয়ের ক্ষমতা এক নয়। লিংঙ্গ ও বয়সের প্রেক্ষাপটে আয়ের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এক জন যুবকের আয় যেখানে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৪০ টাকা সেখানে এক জন শিশু বা বৃদ্ধের আয় নেই বল্লেই চলে। আবার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা যায়। তাই বেশির ভাগ সাঁওতাল বিয়ের পর যৌথ পরিবার ভেঙ্গে অনু পরিবারই গঠন করছে। এতে স্বাধীনতাও রয়েছে। কেননা যৌথ পরিবারের বয়োজৈষ্ঠ্যে সদস্য আদেশ নিষেধ সব কিছুতেই মেনে চলতে হয়। দিনাজপুরের সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমানে তাই অনুপরিবারের সংখ্যা বেশি। আলীর বিশ্লেষণে দেখা যায়,[১২] 'The traditional family structure of the santals was joint family, but now in the santal villages, there is predomenence of nuclear family pattern, this is due to the changing land tenture system of the country. Due to diffusion in the form of modernism, the pattern of family influence of the santal locality tends to weaken in socio-economic structure.

গবেষণাধর্মী উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামে ৭৫%, চন্দ্রপুর গ্রামে ৮৪.২% এবং রাজাপুর গ্রামে ৬২.৫% অনুপরিবার দেখা যায়। তবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন অনুপরিবারগুলো একসাথে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন প্রকারের বিবাহের রীতি নীতি প্রচলিত। সাঁওতালরা বিবাহকে 'বাপলা' বলে উল্লেখ করে। Malley, Datta Majumdar[১৩] এর মতে, সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী বিবাহ ৭ প্রকার এবং ভৌমিকের মতে ৯ রকম।[১৪] অন্যদিকে আব্দুল কাদির (১৯৯৫)[১৫] সাঁওতালদের বিবাহ রীতিকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন।

১) বাপলা বা কিরিঙ বহু ২) গরদি জাওয়ে ৩) ইতুত বাপলা ৪) নিরু বোলক ৫) সাঙ্গা এবং ৬) কিরিঙ জাওয়ে গবেষণাধর্মী ৩টি গ্রামে তিন ধরনের বিবাহের রীতি দেখতে পাওয় যায়-

২) টুংকি দিপিল বাপলাঃ এ বিয়ের প্রচলণ সবচেয়ে বেশি। এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কনে পনের (Bride Price) মাধ্যমে।

৩) কিরিঙ বহু বাপলা ঃ এটি অভিভাবকের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ।

৪) গরদি জাওয়াই বাপলাঃ এ বিবাহের রীতি অনুযায়ী বিবাহের পর জামাই মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করে।

উপরোক্ত তিন প্রকার বিবাহের পাশাপাশি বর্তমানে পাত্র-পাত্রীরা নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ করতে পারে। যা পূর্বে সমাজে অপরাধ ও বাকা দৃষ্টিতে দেখা হতো। যৌতুক প্রথা পূর্বে তাদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। বরং মেয়ের পরিবারকে কনে পণ (Bride Price) দেওয়া হতো। বর্তমানে গবেষণাধীন সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় ৭০% কোন না কোন উপায়ে মেয়েদের পরিবার থেকে যৌতুক গ্রহণ করেছে। যৌতুক হিসেবে এখানে সাইকেল, গরু, নগদ অর্থ, শুকর ইত্যাদি প্রদান করা হয়। পূর্বে গোত্রের সমস্যা না হলে আর্থিকভাবে বর অস্বচ্ছল হলেও স্বচ্ছল কনে পরিবার তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিতো। কিন্তু বর্তমানে গোত্রের চেয়ে বরের আর্থিক অবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক অবস্থা :

সাঁওতালদের রয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় গ্রামে প্রধান মাঝি (মানঝি) নামে পরিচিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক জীবন, আইন শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। গবেষণাধর্মী ৩টি গ্রামে মাঝি হবার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয় বিশেষ দক্ষতা। আইন শৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব, নিরসন , গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ও শিকারের কাজে তার বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন হয়। একজন মাঝিকে সাহায্য করার জন্য ৬ জন সহকারী থাকেন। এরা হলো পারানিক, ডগ মাঝি, জগ পারনিক, গোডেত, নায়েকে এবং কুডাম নায়েকে।[১৬]

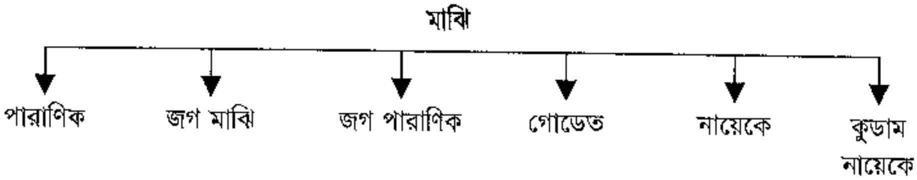

সাঁওতালদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হয় পঞ্চায়েত। গ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কলহ-বিবাদ মীমাংসা করা, বিভিন্ন উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালন করাসহ বিভিন্ন কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কেউ পঞ্চায়েতের নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে সমাজচ্যুত বা জরিমানা করা হয়। কোন কারণে মাঝি গ্রামের বাইরে চলে গেলে বা শারীরিকভাবে অসুস্থ্য থাকলে পারাণিক পুরো গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করে। তরুণ তরুণীদের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে জগ মাঝি। জগ মাঝির সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জগ পারানিক, মাঝির নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, উৎসব, বিচার-সালিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের খবর দিয়ে একত্রিত করেন গোডেত। নায়েকে পূজা অর্চনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তার সহকারী হিসেবে থাকেন কুডাম নায়েকে। তবে গবেষণাকৃত এলাকায় পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে মূলত মাঝি এবং গোডেতকেই দেখা যায়। বর্তমানে গ্রামগুলোতে একজনের পরিবর্তে অনেকে মিলে নায়েকের দায়িত্ব পালন করে।

বর্তমানে দিনাজপুরে সাঁওতালদের জীবনে মাঝিদের প্রভাব ক্রমশ কমে যাচ্ছে। জাতীয় রাজনীতির প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে মাঝিরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। মাঝি সদস্যদের ন্যায় বিচার দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাছাড়া মাঝি তার গ্রামের সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামবাসীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হওয়ায় নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে মাঝির পরিবর্তে সরকারি প্রশাসনের উপর নির্ভর করছে। এছাড়া ক্ষমতা নিয়ে মাঝি এবং সদস্যদের দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। আবার মাঝি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গোত্রের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যে গোত্র থেকে মাঝি নির্বাচিত হয় সে গোত্রের সদস্যরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। ফলে ক্ষমতাবান এবং

ক্ষমতাহীনদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদৃষ্ট আচরণ। পূর্বে বিচার সালিশ প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার জন্য তারা মাঝির উপর নির্ভর করলেও বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই তারা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের শরনাপন্ন হচ্ছে। এছাড়া আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ গ্রাম গুলোতে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন তাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায় ক্ষমতায়নে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংগঠন বেশ ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে এবং ধীরে ধীরে তারা জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ সক্রিয়ভাবে জাতীয় রাজনীতিতে সমর্থনও করছে। তারা তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বতা করছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, তাদের মধ্যে পূর্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকলেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐক্যমত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যকার ঐক্য অনেকাংশে কমে গেছে।

সাঁওতালদের সকল পরব বা উৎসবগুলো মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ডেল্টন[১৭] সাঁওতালদের ৩টি উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলো হলোঃ-

১) সারগুল উৎসব ঃ মার্চ মাসে পালন করা হয়। শাল ফুল ফোটাকে কেন্দ্র করে।

২) মাইমুরি উৎসব ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পালন করা হয়। ফসল কামনা।

৩) নবান্ন উৎসব ঃ ডিসেম্বর মাসে পালন করা হয়। শস্য ঘরে তোলার পর।

হান্টার সাঁওতালদের দশটি ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের কথা বর্ণনা করেছেন। উৎসবগুলো হলো ঃ

সাঁওতালি উৎসবের বৈশিষ্ট্য

উৎসব	উৎসবের নাম	উপলক্ষ্য
সোহরাই	ডিসেম্বর জানুয়ারী (পৌষ মাঘ)	ফসল কাটা উৎসব
সাকরাত	জানুয়ারী (পৌষ)	শিকার ও পূর্ব পুরুষের উপাসনা
যাত্রা	ফেব্রুয়ারী (ফাল্গুন)	আনন্দ উৎসব
বাহা	ফেব্রুয়ারী (ফাল্গুন)	বসন্ত উৎসব
পাতা	মধ্য এপ্রিল (বৈশাখ)	ধর্মীয় উৎসব
এরকসিম	জুন (আষাঢ়)	বীজ বপন উৎসব
হারিয়াট সিম	জুলাই (শ্রাবণ)	ধান লাগানো উৎসব
ছাতা	অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ)	ধর্মীয় উৎসব
ইড়ি মুন্দলি	নভেম্বর (কার্তিক)	শস্য উৎসব
হরো	নভেম্বর-ডিসেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ)	ধান-পাকা উৎসব

সাঁওতালদের প্রধান উৎসব হিসেবে মূলত তিনটি উৎসবকে চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো দূর্গাপূজা, সোহরাই বা পৌষনা এবং বাহা উৎসব।

দূর্গাপূজা

সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে দূর্গাপূজাকেই চিহ্নিত করা যায়। বেশ ধুমধামের সঙ্গে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে একই সময়ে একই মন্দিরে এ অনুষ্ঠান পালন করে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে বর্তমানে তাদের এ উৎসবের মধ্যে পরিবর্তন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে দূর্গোৎসবে পাতা টানা (রুম বোঙ্গা) নামক এক ধরনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পালিত হলেও বর্তমান সময়ে উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামে তা দেখা যাচ্ছে না। কারণ হিসেবে তরুন প্রজন্মের খ্রিস্টান ধর্মীয় রীতি নীতির প্রতি আকর্ষণ, সনাতন প্রথার উৎসবের প্রতি উদাসীনতাকে চিহ্নিত করা যায়।

সোহরাই বা পৌষনা ঃ

অগ্রহায়ন মাসে ফসল তোলার পরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবুতরের মাংস ও চাল দিয়ে তৈরি এক ধরনের বিশেষ খাদ্য (সড়ে দাকা) তৈরি করে সকলের মধ্যে বিতরন করা হয়। পরে বিভিন্ন পূজা-পর্বণ শেষে নাচ ও পানাহারের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিন ধরে চলে এ উৎসব। আয়োজনে পানীয় হিসেবে থাকে হাড়িয়া এবং আরো থাকে বিভিন্ন রকমের পিঠা। তবে বর্তমানে দারিদ্র এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় রীতি নীতির প্রভাবে তাদের এ অনুষ্ঠান দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, এ সময়ে তারা প্রচুর পরিমাণে হাড়িয়া পান করার জন্য স্বাভাবিক জ্ঞান, বুদ্ধি কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে ফেলে। ফলে এ সময়ে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যা বর্তমানে তাদের তরুণ প্রজন্ম ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ভালভাবে দেখে না। এ জন্য বর্তমানে অনেকের মধ্যেই হাড়িয়া পান বিদ্বেষী একধরনের মানসিকতা গড়ে উঠছে।

বাহাঃ

বাহা সাঁওতালি শব্দ। এর অর্থ ফুল। ফাল্গুন মাসে তারা এ অনুষ্ঠান (পহেলা ফাল্গুন) পালন করে। এই দিন মেয়েরা শাড়ি পড়ে , চুলের খোপায় বিভিন্ন ফুল গোঁজে এবং ছেলেরা রঙ বেরঙের পোষাক পরে। কিন্তু বর্তমানে এ উৎসব আর দেখা যায় না। গবেষণাধীন ৩টি গ্রামে দেখা যায়, অধিকাংশ সাঁওতালই এ উৎসবের নিয়ম নীতি সম্পর্কে পুরোপুরি জানে না। কারণ হিসেবে কাজের চাপ এবং দীর্ঘদিন থেকে উৎসব পালন না হওয়াকেই তারা উল্লেখ করে।

অর্থনৈতিক জীবনঃ

সাঁওতালেরা প্রথাগতভাবে পূর্বে ছিল কৃষিজীবি। তাদের অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবেই ছিল কৃষি ভিত্তিক। নিজস্ব জমি চাষের পাশাপাশি তারা বর্গাচাষের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান তাদের ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া অধিকাংশই দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। দিনাজপুরের সাঁওতালদের এক বিরাট অংশ অন্যের কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। আলীর মতে[১৮], The partition of Bengal in 1974, the Zamindary abolution in 1950, the 'Nachole santal disturbance' in 1949, the communal riots like 'Dharsha and Santahar' in 1962 liberation war in 1971 and such other political upheavals and turmoils had a great impact on their economic life Now, a great majority of the Santals have become landless wage earners and a few are engaged in the agricultural sector as well.

দিনাজপুরের সাঁওতালেরা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েই মূলত বর্গাচাষী হতে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে রয়েছে প্রশাসনিক নীতিমালা, হিন্দু এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রভাব, দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়। সরকারী নীতিমালা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শক্তি প্রয়োগ ও দুর্নীতির কারণে তাদের অধিকাংশই চাষযোগ্য জমি হারিয়েছে। ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দ্বারা নানাভাবে তারা শোষনের স্বীকার হয়েছে। জীবন ধারনের জন্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করে উপার্জন করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। বলা যেতে পারে এর ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে বদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে তারা বাধ্য হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিও তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল করে তুলেছে। ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি মজুরির পাশাপাশি তারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত। কৃষি মৌসুমে অন্যের জমিতে মজুরি খাটলেও অন্য মৌসুমে তারা খন্ডকালীন খনি শ্রমিক এবং ভাটা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এসব জয়গায় তারা ১২/১৪ ঘন্টা কাজ করে থাকে। এছাড়াও তারা রিকসা চালিয়ে এবং মুসলমানদের বাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে কাজ করে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন যাপন করে। পূর্বে তাদের মাঝে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ এবং ওঝারা পুরোপুরি পেশাদার হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু বর্তমানে এদেরকে পূর্নাঙ্গ পেশাদাররূপে দেখা যায় না। এ কাজের পাশাপাশি তাদেরকে অন্যান্য পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যায়।

কৃষি ও অকৃষি মৌসুমে সাঁওতালদের বিভিন্ন পেশার শতকরা হার ঃ

কৃষি মৌসুমে	**শতকরা হার**
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত	১৩%
সিকিউরিটি গার্ড	২%
গার্মেন্টস কর্মী	৪%
কৃষিকাজ ও বর্গাচাষ	২০%
শ্রমিক (কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে)	৫৯%
অন্যান্য	২%
	মোট ১০০%

অকৃষি মৌসুমে	**শতকরা হার**
বর্গাচাষ ও কৃষি কাজ	২০%
কৃষি শ্রমিক	২৫%
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত	১৩%
সিকিউরিটি গার্ড	২%
গার্মেন্টস কর্মী	৪%
রিকসা চালক	৪%
ভাটা শ্রমিক	২০%
খনি শ্রমিক	৮%
অন্যান্য	৪%
	মোট ১০০%

সাঁওতাল মহিলারা পুরুষের সাথে মাঠে কৃষিকাজ করে থাকে। সব ধরনের কাজে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে তাদেরকে পুরুষের ন্যায় মজুরী প্রদান করা হয় না। এদের মাঝে ধনী-দারিদ্র্যের ব্যবধান অতি নগন্য। যেহেতু তারা অধিকাংশই আর্থিক অস্বচ্ছলতার মাঝে জীবন যাপন করে এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্থের উপর নির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব জমির পরিমাণ খুবই কম, যা আছে শুধু বসত ভিটা এবং সামান্য আবাদি জমি।

গবেষণাধীন ৩টি গ্রামে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এখানকার কিছু সাঁওতাল বিভিন্ন এনজিওতে চাকুরীরত রয়েছে। ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, কারিতাস, গ্রাম বিকাশ আশ্রয়সহ বিভিন্ন এনজিও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এছাড়াও নগরায়নের প্রভাবে অনেক সাঁওতালই বর্তমানে শহরমুখী হচ্ছে। শহরে মূলত তারা রিক্সা চালক, গার্মেন্টস কর্মী এবং সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দেখা গেছে চন্দ্রপুর এবং উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামের যেসব পরিবারের সদস্যরা শহরে কর্মরত তাদের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য পরিবারের তুলনায় বেশ ভালো। তারা অন্যান্যদের তুলনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং আর্থিক সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বেশ সচেতন।

সাঁওতালেরা কৃষি মজুরির পাশাপাশি বিভিন্ন পেশায় কর্মরত থাকলেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে তারা নিরাপত্তা বোধ করেনা। তাদের নিরাপত্তাহীনতার এ অবস্থায় বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারীগুলো তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করছে এবং চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। শিক্ষার প্রসারে তারা প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করছে। এছাড়াও জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহের পাশাপাশি তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে। এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাঁওতালদের জীবন যাত্রাকে মিশনারীগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। এদিক থেকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ পিছিয়ে রয়েছে। মুসলমান হতে গেলে সাঁওতালদের তাদের সনাতন সকল

রীতিনীতি ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু খ্রিস্টান বা হিন্দু ধর্মে তাদের সনাতন রীতি পুরোপুরি ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে সাঁওতালদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তুলনায় খ্রিস্টান কিংবা হিন্দু ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারীগুলো দিচ্ছে বিশেষ আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা। তাই সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তারা খ্রিস্টান ধর্ম ও রীতিনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, কারিতাস, গ্রাম বিকাশ সহ বিভিন্ন এনজিও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, গৃহ নির্মাণ, পশু পালন, কৃষি ঋণ, প্রদান ও বনায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সহযোগিতা করছে। ফলে সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এনজিওগুলো সাঁওতালদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সুতরাং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক প্রভাব, খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব, বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কারণে দিনাজপুরের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রক্রিয়া পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যা তাদের জীবন বোধকে পরিবর্তিত করছে। তবে এই পরিবর্তন তারা সময়ের ও প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে যা তাদের জীবন বোধকে পরিবর্তিত করছে। তবে এই পরিবর্তন তারা সময়ের ও প্রয়োজনের তাগিদে মেনে নিলেও মানুষিকভাবে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। ফলে এক ধরনের হতাশা ও দোদুল্যমান অবস্থা তাদের জীবনে লক্ষ্য করা যায়। তাই বৃহত্তর বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর উচিত সাঁওতালদের প্রথাগত ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে তাদেরকে বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

তথ্যপঞ্জী

১। Dalton e. J; *Descriptive Ethnology of Bengali Calcutta*; Government Press, 1973.
২। Dalton E. J. 1973;
৩। ফারহাত জাহান, *সাঁওতাল আচার-অনুষ্ঠানঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ও বাস্তবতা*, সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা-, পৃ-৫৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২০০৩।
৪। পার্থ সেন, "দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভূমিকা" 'ইশানী চক্রবর্তী' দিনাজপুরের আদিবাসীদের সাম্প্রতিক সমস্যা ও প্রতিরোধ, আহমেদ, শরীফ উদ্দীন, (সম্পাদিত), দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি*, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ-৪৬৮।
৫। ফারহাত জাহান, *পূর্বোক্ত*, পৃ-৫৩।
৬। L. S. S. O. Matey, Bengal District Gazestters, Santal Pargonas, West Bengal District Gazetters.
৭। Daltan, *পূর্বোক্ত*। Department of Higher Education, Government of west Bengal, Calcutta, P-141.
৮। Ahsan Ali, *Santals of Bangladesh*, Institute of Social Research and Applied Anthropology, Medanipur, W. B. 1998, P-232.
৯। Risley, The People of India, 1915, P-233
১০। Ahsan Ali *পূর্বোক্ত*, P-95
১১। শাহানা কায়েস, *সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় রাজশাহীর সাঁওতাল সম্প্রদায়*, আই এস বি জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১০; পৃষ্ঠা-১৭০।
১২। Ahsan Ali; *পূর্বোক্ত*, P-184
১৩। Datta Majumdar, N. 1956, *The Santal : A study in Culture*, Delhi, Manager of Publication.
১৪। Bhowmick, K. L. *Tribal India: A profile in Indian Ethnology*, Calcutta, The World Press Private Ltd., 1971
১৫। আব্দুল কাদির, *পাকিস্তানের উপজাতি*, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ২য় সংস্করন, ১৯৬৬, পৃ-৭
১৬। Dalton, *পূর্বোক্ত*, P-213
১৭। Hunter W. W 1868, *The Annals of Rural Bengal*, London, Smith Elder and Co. P-463.
১৮। Ahsan Ali *পূর্বোক্ত*, P-96